পঞ্চম অধ্যায়

উপভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আইন
(Laws relating to Consumer Rights)

উচিত দামে সঠিক পণ্য বা জিনিস পাওয়া হল ক্রেতাদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার রক্ষার্থে 1986 সালে Consumer Protection Act তৈরি হয়। উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ অনুযায়ী যিনি ব্যবহারের জন্য পণ্য বা পরিষেবা কেনেন বা ভাড়া করেন (বাণিজ্যিক কারণে নয়) তিনি হলেন উপভোক্তা। এই আইনে বলা হয়েছে, "An Act to provide for better protection of the interests of consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils ..."

উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ (Consumer Protection Act 1986)-এ উপভোক্তাদের কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছে:

ক) জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তুর বিপণনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অধিকার
খ) পণ্যের গুণমান, পরিমাণ, শুদ্ধতা, মান এবং দামের সম্পর্কে তথ্যের অধিকার
গ) প্রতিযোগিতামূলক দামে বিভিন্ন রকম পণ্যের মধ্যে থেকে বাছাইয়ের অধিকার
ঘ) শুনানির অধিকার
ঙ) প্রতিকার লাভের অধিকার
চ) উপভোক্তা শিক্ষার অধিকার

উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে উপভোক্তা অভিযোগ প্রতিকার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরাম কমিশনকে। উপভোক্ত সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গঠিত প্রায় কার্যত বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা বা স্বল্প খরচে সহজে এবং দ্রুত প্রতিকার সাধন করে। প্রতিকার পেতে হলে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। দাবির পরিমাণ অনুযায়ী ১০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ফি লাগে।

অভিযোগ জানানোর জন্য যেসকল তথ্য প্রয়োজন সেগুলি হল:

১। অভিযোগকারীর পুরো নাম ও ঠিকানা

২। বিরুদ্ধ পক্ষের পুরো নাম ও ঠিকানা

৩। পণ্য অথবা পরিষেবার বিবরণ

৪। ক্রয়ের অথবা ভাড়ার প্রমাণপত্র

৫। ক্ষতির প্রকৃতি

৬। অভিযোগের কারণ ঘটার তারিখ

৭। কী প্রতিকার চান

কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায়:

১। পণ্য/পরিষেবার ক্রুটি/ঘাটতি দূর করা

২। জিনিসটি বদলে দেওয়া

৩। মূল্য ফেরত

৪। বিরুদ্ধ পক্ষের গাফিলতির বা পণ্যের ক্রুটির জন্য উপভোক্তার ক্ষতি বা হয়রানি বাবদ ক্ষতিপূরণ

৫। অসাধু ব্যবসায় বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ

৬। ক্ষতিকর জিনিসের বিপণন বন্ধ করা

৭। বাজার থেকে ক্ষতিকর জিনিস প্রত্যাহার

৮। ক্ষতিকর জিনিস তৈরি বন্ধ করা এবং ক্ষতিকর পরিষেবা প্রত্যাহার করা

সাধারণ দোকান বা বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি অবশ্যই এই আইনের আওতায় পড়ে। তবে এই আইনের বিস্তৃতি খুবই ব্যাপক। যেমন, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, চিকিৎসক, ফ্রিজ, রেল, কেবল্ টিভি, ক্যুরিয়র সার্ভিস ইত্যাদির বিরুদ্ধে উপভোক্তা অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন অথবা অবসরকালীন সুবিধা না পাওয়ার জন্য মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আছে। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, বেসরকারি চিকিৎসক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কিছু ক্ষেত্রে) ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযোগও এই আইনের আওতায় আসে।

জেলা ফোরামের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা ৩০ দিনের মধ্যে রাজ্য কমিশনের কাছে করতে হবে। আবার রাজ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় কমিশনে করতে হবে।

উপভোক্তা কীভাবে অভিযোগ জানাবেন
(How to file a Consumer Complaint)

১। প্রথম পর্যায়: কোন এলাকায় এবং কোন ফোরাম, (forum— অর্থাৎ জেলা, রাজ্য না জাতীয় স্তরে)-এ অভিযোগটি দাখিল করতে হবে।

২। একটি নির্দিষ্ট ফি (fee) জমা দিতে হবে

৩। অভিযোগটির খসড়া তৈরি করে পুরো ঘটনাটির বিরবণ দিতে হবে

৪। কোনো আইনজীবীকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন নেই

৫। ভারতে 569টি জেলা উপভোক্তা ফোরাম, 33টি রাজ্য ও সর্বোপরি জাতীয় উপভোক্তা ফোরাম রয়েছে

কুড়ি লক্ষ টাকার নীচে কোনো দ্রব্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে জেলা ফোরাম

কুড়ি লক্ষ টাকার উপর থেকে এক কোটি টাকার নীচে পর্যন্ত রাজ্য স্তরে, এবং

এক কোটি টাকার উপরে জাতীয় ফোরামে অভিযোগ জানাতে হবে।

৬। একজন ক্রেতা বা তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারী বা আত্মীয় এই অভিযোগ করতে পারেন (কিন্তু resale করা বা পুনর্বার বিক্রয় করার জন্য যদি তিনি ক্রয় করে থাকেন তাহলে নয়)। নিজের উপভোগের জন্য ক্রয় করেছেন এরূপ ব্যক্তিই অভিযোগ করতে পারবেন।

The Consumer Protection Act, 1986 ছাড়াও আমাদের দেশে ক্রেতা সুরক্ষার জন্য আরও কতকগুলি আইন রয়েছে, যথা Sale of Goods Act, 1930, The Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937, The Drugs and Cosmetics Act, 1940, The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, The Food Safety and Standards Act, 2006, The Essential Commodities Act, 1955, The Legal Metrology Act, 2009 ইত্যাদি। কিন্তু এই আইনগুলির ধারা অনুযায়ী ক্রেতা বা উপভোক্তা মামলা দায়ের করলে একটি দীর্ঘায়িত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সে পড়ে যায়। এগুলির অসুবিধা দূর করার জন্য CPA বা Consumer Protection Act পাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "The CPA provides for quick and easy remedy to consumers under a three-tier quasi-judicial redressal agency at the District, State and National levels."

মোটামুটিভাবে CPA উপভোক্তাদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সুরক্ষিত করে:

- জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক দ্রব্য ও পরিষেবা বাজারে বিক্রয় করা বন্ধ করা সংক্রান্ত আইন (Right against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property);

- দ্রব্য বা পরিষেবার গুণগতমান, উৎকর্ষ, পরিমাণ, শুদ্ধতা, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকার (Right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services);
- বিভিন্ন দ্রব্য ও পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক দামের মধ্যে পছন্দের অধিকার (Right to choice, wherever possibel through access, to a veriety of goods and services at competitive prices);
- উপভোক্তাদের ফোরামে ক্রেতাদের কথা শোনা হবে এবং তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এরূপ নিশ্চয়তার অধিকার (Right to be heard and to be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate forums);
- অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার ও অন্যায্য বাণিজ্য পন্থার বিরুদ্ধে প্রতিকার পাবার অধিকার (Right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers);
- উপভোক্তাদের সচেতন বা শিক্ষিত হবার অধিকার (Right to consumer education);
- স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর পরিষেবা পাবার অধিকার (Right to clean and healthy environment)।

প্রতিকারের ব্যবস্থা

জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে উপভোক্তা সুরক্ষা কমিশন আছে—

- জাতীয় স্তরে রয়েছে National Consumer Disputes Redressal Commission— এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের দ্রব্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ থাকলে জাতীয় কমিশনে যাওয়া যেতে পারে।
- রাজ্য স্তরে রয়েছে State Consumer Disputes Redressal Commission— কুড়ি লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে এখানে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।
- জেলা স্তরে রয়েছে District Consumer Dispute Redressal Forum। কুড়ি লক্ষ টাকার নীচে যে কোনো দ্রব্য বা পরিষেবা নিয়ে এখানে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আইন
(Laws Relating to Cyber Crimes in India)

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ। স্বাভাবিক কারণেই এই সময়টিকে 'Age of Information' বলা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির যেমন কতকগুলি সুবিধাজনক বা ভালো দিক আছে তেমনি Information and Communication Technology বা ICT-কে অপরাধমূলক কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা Cyber Crimes সংক্রান্ত আইনগুলি নিয়ে আলোচনা করব। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইন বা 2013 সালের Policy on National Cyber Security-তে Cyber Crimes-এর সঠিক বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি; হয়তো দেওয়া সম্ভবও নয় কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গতিশীল এবং প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির উন্নতি ঘটছে। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code), Information Technology Act, 2000 (2008 সালে সংশোধিত) আইনে cyber crime-এর বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "Cyber laws in India prevent any crime done using technology, where a computer is a tool for cyber crime. The laws for cyber crime protect citizens from dispensing sensitive information to a stranger online." সাইবার আইনের উদ্দেশ্য হল বৈধ কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে অসাধু অপরাধপ্রবণ মানুষের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত করা। বৈধ ব্যবহারকারীর গোপন তথ্য যাতে ফাঁস না হয়ে যায় এবং তা সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করা।

"Cyber crime has been identified as a crime which is essentially a combination of computer and crime. Thus, an offence done with the computer is cyber crime." সাধারণভাবে বলা যায় কম্পিউটার ও অপরাধের সমন্বয়ে সাইবার অপরাধ ঘটে। কম্পিউটারকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অন্য কোনো ব্যক্তির গোপন তথ্য চুরি করা বা তাকে ভীতি প্রদর্শন করা, অযাচিত message পাঠিয়ে বিরক্ত করা ইত্যাদি সাইবার অপরাধের দৃষ্টান্ত।

"In today's world of cyber space which is largely dependent upon the internet and use of technology, the incidents of cyber crime have increased." বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার যত বৃদ্ধি পাবে cyber crime-এর ঘটনাও তত বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ মানুষের কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে 'hacker'-রা অপরাধ করে থাকে।

Cyber law নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

- Cyber crimes
- Electronic and digital signatures
- Intellectual property
- Data protection and privacy.

In cyber crime, the computer can either be a tool, target or both. সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে মাধ্যম বা tool হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; আবার অন্য কম্পিউটারই অপরাধের target হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের cyber crime হতে পারে:

- Identity theft বা পরিচিতি চুরি করা: কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য গোপনে চুরি করে যখন তাঁর credit card বা ইত্যাদি ব্যবহার করে টাকা তুলে নেওয়া হয় বা ঋণ নেওয়া হয় তখন তাকে বলে identity theft।
- Cyber bullying বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভয় দেখানো: Internet, mobile phone, messaging বা এই জাতীয় social network ব্যবহার করে যখন কাউকে হেনস্থা করা হয় বা তাঁর মানহানির চেষ্টা করা হয় বা ভীতি প্রদর্শন করা হয় তখন তাকে বলে cyber bullying। সাধারণত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা এগুলি করে থাকে। পরিণত বয়স্ক মানুষ এধরনের কাজ করলে তাকে বলে cyber stalking।
- Cyber terrorism বা সাইবার সন্ত্রাস: কোনো উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যখন কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, জনপ্রতিষ্ঠান, সরকার বা রাষ্ট্রকে তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করে তখন তাকে বলে সাইবার সন্ত্রাস।
- Hacking বা তথ্য চুরি: অন্য ব্যক্তির কম্পিউটারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে password চুরি করে যখন খারাপ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলে hacking।

সাইবার আইনের উদ্দেশ্য হল:

- কম্পিউটারজনিত অপরাধ বন্ধ করা
- বৈদ্যুতিন তথ্য (elcctronic data) সুরক্ষিত রাখা
- বৈদ্যুতিন লেনদেন (electronic transaction) সুরক্ষিত রাখা।

IT Act ছাড়াও অন্যান্য সাইবার আইনের মধ্যে রয়েছে:

- ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)
- Indian Evidence Act
- Banker's Book Evidence Act
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন

সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষিত থাকার কতকগুলি উপায় আছে:

- Unsolicited text message— অযাচিত কোনো মেসেজে সাড়া না দেওয়া।
- Downloads on the mobile phone— কোনো বিশ্বস্ত উৎস থেকেই ডাউনলোড করা।
- Online buying—ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় করার সময় সতর্ক থাকা।
- Rating and feedback— বিক্রেতার rating ও feedback সম্পর্কে যাচাই করে নেওয়া।
- Personal Information Request— কেউ ব্যক্তিগত তথ্য চাইলে তা না দেওয়া। Credit card fraud, Pornography ইত্যাদি আরও নানা ধরনের অপরাধ রয়েছে।
- Safe Browsing আর একটি পন্থা।

Information Technology Act 2000-এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "An Act to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as electronic commerce, which involve the use of alternative to paper-based methods of compunction and storage of information to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, The Banker's Books Evidence Act 1891 and The Reserve Bank of India Act 1934 and for matters connected therewith or incidental thereto."

এককথায় এই আইনের উদ্দেশ্য হল তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার বন্ধ করা ও সাইবার অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

Cyber crimes are crimes that involve a computer and a network; in some cases, the computer may have been used in order to commit the crime, and in other cases, the computer may be the target.

সাধারণভাবে cyber crime বলতে বোঝায়:

1. Identity theft and fraud: অন্য ব্যক্তির পরিচিতি ও তথ্য চুরি করা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা।
2. Ransomware: Computer network-এ এইটি প্রবেশ করে hacker কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ransom বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।
3. DDos attack: Extortion বা blackmail-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।
4. Botnets: Large network of infected computers called Botnets are developed by planting malware on the victim computer.
5. Spam and Phising: Spam হল অযাচিত (unwanted) ইমেল; আর Phishing হল একটি পদ্ধতি যার দ্বারা সাইবার অপরাধী কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে লোভ (bait) দেখায় (লটারি ইত্যাদি), তার পরে তথ্য জোগাড় করে।
6. Social Engineering: এক্ষেত্রে আস্থা অর্জন করে তথ্যগুলির অপপ্রয়োগ করে।
7. Malvertising: Malicious advertisement কথাটির সন্ধি করে malvertising কথাটি সৃষ্টি করা হয়েছে। মনোগ্রাহী বিজ্ঞাপন দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মন জয় করে তার ক্ষতি সাধন করা।
8. PuPs: Potentially unwanted Programmes বা PuPs আর একটি সাইবার অপরাধের পদ্ধতি।
9. Drive-By-Downloads: Download of malicious code in the user's computer. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'target computer'-এ অযাচিত materiral download করিয়ে দেওয়া হয় সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।
10. Remote Administration Tools: RAT device দ্বারা বেআইনি কাজ করা। দূর থেকে এই অপরাধমূলক কাজ করা যেতে পারে।
11. Exploit Kits: এমন Kit জোগান দেওয়া হয় যার দ্বারা বৈধ ব্যবহারকারী exploited বা শোষিত হন।
12. Scams: টেলিফোন করে hacker-রা বা scamster-রা কম্পিউটার সারিয়ে দেবার কথা বলে ও তথ্য চুরি করে।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতের Infomation Technology Act 2000-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে ইংরাজিতে ও পরে সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় দেওয়া হল। (সব ইংরাজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সম্ভব নয় বলে মূল ইংরাজিটি দেওয়া হল।)

Summary of I.T. Act

Preamble

Chapter 1: Preliminary *(section 1-2)*
Chapter 2: Digital Signature and Electronic Signature *(section. 3-3A)*
Chapter 3: Electronic Governance *(section 4-10A)*
Chapter 4: Attribution Acknowledgment and Dispatch of Electronic Records *(section 11-13)*
Chapter 5: Secure Electronic Records And Secure Electronic Signatures *(section 14-16)*
Chapter 6: Regulation of Certifying Authorities *(section 17-34)*
Chapter 7: Electronic Signature Certificates *(section 35-39)*
Chapter 8: Duties Of Subscribers *(section 40-42)*
Chapter 9: Penalties Compensation And Adjudication *(section 43-47)*
Chapter 10: The Cyber Appellate Tribunal *(section 48-64)*
Chapter 11: Offences *(section* 65-78)
Chapter 12: Intermediaries Not To Be Liable In Certain Cases *(section 79)*
Chapter 12A: Examiner Of Electronic Evidence *(section 79A)*
Chapter 13: Miscellaneous *(section 80-90)*

IT Act-এর এগারো নম্বর অধ্যায়ে (chapter II) Section 65-78-তে সাইবার অপরাধগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ:

Section 65: Tampering with Computer Source (কম্পিউটার উৎসের বিকৃতি)
Section 66: Computer Related Offence (কম্পিউটার সংক্রান্ত অপরাধ) Section 43-তে এগুলি বলা হয়েছে
Section 66A: Punishment for sending offensive messages through communication service, etc. (অরুচিকর তথ্য প্রেরণ)
Section 66B: Punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device (অসাধু উপায়ে যোগাযোগ মাধ্যম সংগ্রহ)
Section 66C: Punishment for Identity theft (অন্য কারুর পরিচিতি চুরি করা)
Section 66D: Punishment for cheating by personation by using computer resource (কম্পিউটার ব্যবহার করে কাউকে ঠকানো)

Section 66E: Punishment for violation of privacy (ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন)

Section 66F: Punishment for cyber terrorism (সাইবার সন্ত্রাস)

Section 67: Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form (অশ্লীল তথ্য প্রেরণ)

Section 67B: Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc. in electronoc form. (শিশুদের যৌন ছবি প্রেরণ)

Section 71: Penalty for misreprresentation (অসত্য তথ্য দাখিল করা)

Section 72: Breach of confidentiality and privacy (গোপনীয়তা ভঙ্গ করা)

Section 72A: Punishment for Disclosure of information in breach of lawful contract (আইনসঙ্গত বা বৈধ চুক্তি ভেঙে তথ্য দিয়ে দেওয়া)

Section 73: Penalty for publishing electronic Signature Certificate false in certain particulars (মিথ্যা বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রকাশ)

Section 74: Publication for fraudulent purpose (মিথ্যা প্রচার)

এইরকম প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য বিস্তারিতভাবে শাস্তির কথা এই আইনে বলা হয়েছে। যেমন সাইবার সন্ত্রাসের দণ্ড হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; আবার অশ্লীল তথ্য প্রেরণের সাজা হল তিন বছরের কারাবাস ও পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। Section 48-এ Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal-কে বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। Sec. 62 অনুসারে Appellate Tribunal-এর রায়ে সন্তুষ্ট না হলে অভিযুক্ত পক্ষ হাই কোর্টে আপিল করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। Jain, Rohit Arbind, *Cyber Crime and Laws.*
২। Tiwari, Garima, *Understanding Laws: Cyber Laws and Cyber Crimes.*
৩। Singh, Yatindra, *Cyber Laws.*
৪। Chander, Harish, *Cyber Laws and IT Protection.*
৫। *I.T. Act,* 2000.

অষ্টম অধ্যায়

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার (Anti-Terrorist Laws: Implications for Security and Human Rights)

সন্ত্রাসবাদ এখন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় স্তরেই একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিতভাবে হিংসার প্রয়োগ হল সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদের মারাত্মক আঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে একাধিক জনসমাজ। ভারতও সন্ত্রাসবাদের শিকার। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য নানা ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের Art. 22-তে বলা হয়েছে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হলে তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে [Art 22(1)]। গ্রেপ্তারের 24 ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে [Art. 22(2)]। আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে [Art. 22])।

সাধারণভাবে সকল আটক ব্যক্তি এই অধিকারগুলি ভোগ করবেন। তবে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি [Art. 22(3)(a)] এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার ব্যক্তির [Art. 22(3)(b)] ক্ষেত্রে এই অধিকারটি প্রযোজ্য নয়। ভারতীয় সংবিধান বিশারদ শ্রী দুর্গাদাস বসুর মতে Preventive Detention বা নিবর্তনমূলক আটক কথাটির অর্থ হল বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা। শাস্তিমূলক আটক থেকে পার্থক্য করার জন্যই এই আটককে নিবর্তনমূলক আটক বলা হয়। শাস্তিমূলক আটকের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। অপরপক্ষে, নিবর্তনমূলক আটকের উদ্দেশ্য কিছু করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা এবং এক্ষেত্রে এই আশঙ্কা করে তাকে আটক করা হয় যে, সে এমন কিছু বেআইনি কাজ করতে যাচ্ছে যা সংবিধানে বর্ণিত কারণগুলির কোনো একটির আওতায় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, নিবর্তনমূলক আটক এমন পরিস্থিতিতেই করা হয় যখন কর্তৃপক্ষের হাতে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, অভিযোগ দায়ের করার পক্ষে বা বিধিসম্মত

প্রমাণাদির সাহায্যে আটক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, তবে তাকে আটক না করলে সে বেআইনি কাজ করবে এমন সন্দেহে তার আটকের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতীয় সংসদ বা রাজ্য আইনসভার দ্বারা প্রণীত বিনা বিচারে আটক রাখার এই আইনকে নির্বতনমূলক আটক আইন বলা হয়। এইরূপ আইনের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়:

1. Preventive Detention Act, 1950 (Repealed)— এই আইনটি ছিল অস্থায়ী। প্রথমে কেবল এক বছরের জন্য তা গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকবার ওই আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। 1969 সালের শেষে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।
2. Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed)– সাধারণভাবে এটি 'মিসা' (MISA) নামে সমধিক পরিচিত। 1975 সালের জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে আইনটির অপব্যবহার বহুবার সমালোচিত হয়েছে। শ্রী দুর্গাদাস বসু উল্লেখ করেছেন যে 1975-76 সালে জরুরি অবস্থার সময় আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা 1,75,000 পর্যন্ত উঠেছিল। ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে জনতা পার্টি বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা রদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এব্যাপারে তাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল, কারণ জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর বুঝতে পারে, সমস্যা কতখানি বাস্তব। শেষে, 1978 সালের এপ্রিল মাসে সংসদে মিসা রদ করা হয়।
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974— সাধারণভাবে এটি 'কোফেপোসা' (COFEPOSA) নামে পরিচিত। এই আইনের উদ্দেশ্য হল চোরাই চালান, বিদেশি মুদ্রার অবৈধ কারবার ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা।
4. National Security Act, 1980— দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এই আইন প্রণীত হয়।
5. Essential Service Maintenance Act, 1981 (ESMA)। কালোবাজার নিবারণ ও অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ রক্ষার স্বার্থে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। 2004 সালে UPA সরকার এই আইন রদ করে দেয়।
6. The Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, 1987 (TADA)। 1995 সালে এই আইনটি রদ হয়ে যায়।
7. Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA)। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই আইনগুলিই 'কালা কানুন' বলে সমালোচিত হয়েছে, কারণ অনেক সময় শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে আইনগুলি প্রণীত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে তিন মাসের অধিক কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না, যদি না বিশেষ উপদেষ্টা পর্ষদ এই ধরনের কোনো বিশেষ প্রতিবেদন দেয় [Art 22(4)(c)]। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আটক ব্যক্তিকে তার আটকের কারণ জানাতে হয় [Art 22(5)], যদি না সরকার সেই তথ্য প্রকাশকে জনস্বার্থ বিরোধী বলে মনে করে [Art 22(6)]। এছাড়া আটক ব্যক্তিকে তার আটকের বিরুদ্ধে আবেদন করার সুযোগও যত দ্রুত সম্ভব দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনগুলির ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে এগুলি অগণতান্ত্রিক।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বাধীনতার অধিকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। তবে এই অধিকার ভোগ বাস্তবে কতটুকু সম্ভব হবে সেই ব্যাপারে সমালোচকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—

১। এই জাতীয় নিবর্তনমূলক আটক আইন তৈরি করে স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। এই আইনগুলি গণতন্ত্রসম্মত নয়।

২। নিবর্তনমূলক আটক আইনগুলি আইনের অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সমালোচিত হলেও অনেকে মনে করেন যে, ভারতের জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারত জর্জরিত। সংবিধান রচনার সময়েও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা খুব একটা সুস্থির ছিল না। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য দেশ ও জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। বর্তমানেও এই প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। তবে সেই ক্ষমতার যাতে অপপ্রয়োগ না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। সচেতন জনগণ, সংগঠিত বিরোধী দল এবং সজাগ ও সদাজাগ্রত নিরপেক্ষ গণমাধ্যম গড়ে না উঠলে স্বাধীনতার অধিকার বিপন্ন হতে পারে।

শ্রী দুর্গাদাস বসুর মতে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও Art 22 একটি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বা 'necessary evil' হিসাবে সংবিধানে বিরাজ করছে।

TADA সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, সাধারণভাবে TADA নামে পরিচিত। আইনটি ছিল একটি সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইন। 1985 থেকে 1995 পর্যন্ত এটি কার্যকরী ছিল। পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি রচিত

হয়। এটি কার্যকরী হয় 23 মে 1985। এরপর 1989, 1991 এবং 1993-তে এটিকে পুনরায় নবীকরণ করা হয়। কিন্তু ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে— এই সমালোচনার মুখে 1995 সালে এই আইনটি আর নবীকরণ করা হয়নি। TADA সম্পর্কে বলা হয়েছে, "It was the first anti-terrorism Law legislated by the Government to define and counter terrorist activities."

POTA সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

The Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA) ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য 2002 সালে গৃহীত হয়েছিল। অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিশেষ করে ভারতীয় সংসদের ওপর উগ্রপন্থীদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে POTA কার্যকর করা হয়। এই আইনটি এর আগের ordinance—Prevention of Terrorism Ordinance (POTA) 2001 ও TADA (1985-95)-র পরিবর্তে কার্যকরী করা হয়। NDA সরকার এটি সমর্থন করে পরে UPA সরকারের আমলে 2004 সালে এটি 'repeal' করে নেওয়া হয়। POTA আইনটিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করা হয়েছে— এরূপ বহু সমালোচনা শোনা যায়। এই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 7 October 2004 UPA সরকার এটি রদ করে দেয়।

সন্ত্রাসবাদ দমন ও মানবাধিকার প্রশ্ন

অস্বীকার করার উপায় নেই যে অবিরত সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটতে থাকলে রাষ্ট্রকে তৎপর হতেই হয় এবং একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে সন্ত্রাসের প্রতিরোধ চালিয়েই যেতে হয়। আবার এই কাজে অসংযত বা বেপরোয়া বলপ্রয়োগ ঘটতে থাকলে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার সমালোচনা ও নিন্দার পাত্র হয়ে পড়ে। কোনো কোনো রাষ্ট্র দেশের অখণ্ডতা বজার রাখার নামে এবং নাগরিক জীবনে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কঠোর আইন-শৃঙ্খলার মাধ্যমে এবং সরকারি দমন-পীড়ন যন্ত্রকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করে সম্ভাব্য সন্ত্রাসকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। দুই ক্ষেত্রেই গুরুতর একটি অভিযোগ ওঠে, যার প্রচলিত নাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে মানবাধিকার এখন একটি স্বীকৃত বিষয়। কোনো রাষ্ট্রে নির্বিচারে মানবাধিকার লঙ্ঘন এখন আর উপেক্ষিত হবার উপায় নেই। Amnesty International-এর সতর্ক নজর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

সভ্যতার ইতিহাসে অসংখ্য আন্দোলন ও বহু মানুষের চিন্তাভাবনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসে অনেক আন্দোলন, অভ্যুত্থান ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের চেতনা আজ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। মানবাধিকারের ব্যাপ্তি ও নিশ্চয়তার মানদণ্ডেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণভাবে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। 1993 সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' (The Protection of Human Rights Act)-এ বলা হয়েছে, মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য, মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অন্তর্গত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

ভারতে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনগুলি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। A.K. Noorani তাঁর *Challenges to Civil Rights Guarantees in India* পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, "Many laws designed to protect the state do little more than protect state power at the expense of her citizens directly flouting the Constitution, International Law and democratic principles." নুরানির মতে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনগুলি রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে এবং তাঁর মতে এর অনেকগুলিই সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন ও গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী।

আর একজন গবেষক Ujjwal Kumar Singh তাঁর *The State, Democracy and Anti-Terror Laws in India* বইতে লিখেছেন এই আইনগুলি 'Politics of repression' বা দমনমূলক রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, "Laws like the POTA are enacted to address what the state describes as extraordinary situations and put in place exceptions to the ordinary legal and judicial procedures ... (But these) extraordinary laws have ramifications for people's lives, political institutions, the rule of law and democratic functioning." অর্থাৎ তাঁর মতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য POTA প্রভৃতি আইনগুলি প্রণীত হয় ঠিকই কিন্তু এই আইনগুলি জনজীবন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আইনের অনুশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

বুকার পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা অরুন্ধতী রায় তাঁর *An Ordinary Person's Guide to Empire* (2006) বইতে লিখেছেন যে একবিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেট বিশ্বায়ন, ধর্মীয় মৌলবাদ, পারমাণবিক জাতীয়তাবাদ ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি— এসব কিছুই একসঙ্গে যুক্ত এবং বর্তমান যুগের কঠিন সমস্যা। এই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ হল: সন্ত্রাসবাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম, জন আন্দোলন ও অপরাধ প্রবণতার বৃদ্ধি। তাঁর নিজের ভাষায়, "In the twenty-first century, the connection

between corporate globalization, religious fundamentalism, nuclear nationalism and the pauperization of the whole populations is becoming impossible to ignore. The unrest has myriad manifestations: terrorism, armed struggle, non-violent mass resistance and common crime." অরুন্ধতী রায় বলেছেন যে পুঁজিবাদের নয়া-উদারনীতিবাদী প্রকল্প কার্যকর করতে হলে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার হরণ করতেই হবে কারণ আম জনতাকে শোষণ করেই ক্যাপিটালিস্টদের বাড়-বাড়ন্ত। রায়ের অনবদ্য ভাষায়, "It is becoming more than clear that violating human rights is an inherent and necessary part of the process of implementing a coercive and unjust political and economic structure in the world. Without the violation of human rights on an enormous scale, the neoliberal project would remain in the dream realm of policy."

তাই মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন জনচেতনা ও উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি পরের অংশে আলোচনা করা হল।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতে গৃহীত ব্যবস্থাদি

ভারতে আজকাল প্রায়শই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনা যায়। সর্বভারতীয় বা রাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। সেই নিয়ে অনুসন্ধান কার্য চলে এবং কমিশনের মতামত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিতও হয়। অধিকাংশ সময়েই অভিযুক্ত হয় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সরকার, সরকারের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর কর্মীরা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নিন্দনীয়।

কিন্তু একই সঙ্গে নিন্দনীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী যথা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির হামলা ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড। দেশ রক্ষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিচ্ছেন তাঁদের অবদান আমাদের স্বীকার করা উচিত। কাশ্মীর ও মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় প্রায়ই নিরাপত্তা কর্মীদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এটাও এক ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন।

কিন্তু অনেক সময়েই অনুচ্চারিত থেকে যায় সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের কাহিনি। যাঁর অধিকার হরণ করে রাষ্ট্রযন্ত্র দোষী, সেই ব্যক্তিই হয়তো রাজনৈতিক বা আদর্শগত কারণে অন্য ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কে 'সন্ত্রাসবাদী' আর কে 'বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত হবে, নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বলা হয় যে "one person's 'terrorist' is another's 'freedom fighter'" । এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।

মানবাধিকার কমিশনগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ না করলে মানবাধিকার আন্দোলন নিয়ে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission)

1993 সালে ভারত সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন পাশ করে (Protection of Human Rights Act, 1993)। ওই আইনের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে।

গঠন— জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সভাপতি ও 5 জন সদস্য এবং পদাধিকার বলে প্রাপ্ত আরও 3 জন সদস্য (মোট 8 জন) নিয়ে গঠিত।

যোগ্যতা— আইনে সদস্যদের যোগ্যতার উল্লেখ আছে।

১। ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে কমিশনের সভাপতি রূপে নিযুক্ত করা হবে।

২। সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজন সদস্য ও হাই কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হবে।

৩। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 2 জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাবে।

পদাধিকার বলে তিনজন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য—

- সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশনের সভাপতি।
- তফসিলি জাতি ও উপজাতি জাতীয় কমিশনের সভাপতি।
- মহিলা জাতীয় কমিশনের সভাপতি।

- কমিশনের একজন মহাসচিব থাকেন। নিউ দিল্লিতে কমিশনের কর্মদপ্তর।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি সদস্যদের নিযুক্ত করেন। নিয়োগ করার আগে তিনি এক কমিটির কাছ থেকে নিয়োগের ব্যাপারে মত গ্রহণ করেন। ওই কমিটির সভাপতি— প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য সদস্যগণ— রাজ্যসভার সহ-সভাপতি, লোকসভার স্পিকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ও রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বেতন ও ভাতা সরকার স্থির করে।

কোনো সদস্যের কার্যকালে তাঁর বেতন, ভাতা ও চাকুরির শর্ত অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায় না।

সদস্যদের কার্যকাল— 5 বছর, কোনো সদস্যের বয়স 70 বছর হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

পদচ্যুতি— কার্যকাল শেষ হবার আগে রাষ্ট্রপতি দুটি কারণে সদস্যদের পদচ্যুত করতে পারেন— অসামর্থ্য ও অসদাচরণ বা দুর্নীতিমূলক কাজ।

কতকগুলো কারণে কমিশনের কোনো সদস্যকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা যায়—

- কোনো সদস্য যদি দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন।
- কমিশনের সদস্য থাকাকালীন অন্য কোনো চাকুরি করেন।

- শারীরিক বা মানসিক কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
- আদালত যদি কোনো সদস্যকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে ঘোষণা করে।
- কোনো সদস্যকে নৈতিক অপরাধের জন্য যদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

◆ কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। স্বশাসিত সংস্থা। কমিশন নিজের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানবাধিকার কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে।

তবে কমিশনের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা সুপারিশমূলক।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা (Functions and Power)

১। কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে সব অভিযোগের অনুসন্ধান করে।

২। ওইরূপ কোনো বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকলে আদালতের অনুমোদন নিয়ে মধ্যস্থতা করতে পারে।

৩। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো সরকারি অফিসার বা কর্মচারীর কর্তব্যপালনে অবহেলা বা ব্যর্থতার বিষয়ে অনুসন্ধান করে।

৪। কারগারের অবস্থা পরিদর্শন করতে পারে।

৫। মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সংবিধানের ধারা ও আইন পর্যালোচনা করে ওই বিষয়ে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৬। মানবাধিকার মূলক আইনের যথাযথ রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৭। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৮। মানবাধিকার বিষয়ে সব আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র বিশ্লেষণ করে সেগুলো কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৯। মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দেয়।

১০। মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজকর্মে উৎসাহ দেয়।

১১। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের চেষ্টা করে।

১২। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা স্থির করে।

কার্যপদ্ধতি

এইসব কাজ পরিচালনার জন্য কমিশন কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে।

- মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অভিযোগের অনুসন্ধানের সময় সাক্ষীদের সমন জারি করে তাদের উপস্থিতি বাধ্য করে।

- কোনো নথি বা কাগজপত্র পেশ করার নির্দেশ দিতে পারে।
- কোনো আদালত বা কার্যালয় থেকে সরকারি রেকর্ড আনাতে পারে।
- ওইসব রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষ কমিটি নিয়োগ করে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারের কাছে রিপোর্ট চাইতে পারে।
- রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশন সরকারকে তার সুপারিশ ও মতামত জানায়।
- ওইসব সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়ে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করে।

- ♦ কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে সে ব্যাপারে প্রতিকার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে।
- ♦ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টের কাছে রিট জমা করার জন্য আবেদন জানাতে পারে।
- ♦ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে।
- ♦ কমিশন সশস্ত্র বাহিনীর মানব অধিকার লঙ্ঘিত হলে ও সে ব্যাপারে অভিযোগ পেলে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইতে পারে।
- ♦ কমিশন তার কার্যাবলি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়।
- ♦ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট সরকার পার্লামেন্টের উভয় সভায় পেশ করে।

কতকগুলো বিষয় মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে—

- যদি কোনো বিষয় বিধিসম্মতভাবে গঠিত অন্য কোনো কমিশনের কাছে বিচারাধীন থাকে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পর এক বছর কেটে গেলে কমিশন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারে না।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (State Human Rights Commission)

মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন অনুসারে ভারতে যেকোনো রাজ্য সরকার রাজ্যস্তরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ও অন্য কয়েকটি রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে।

গঠন

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়—

১। হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি — সভাপতি

২। হাই কোর্টের বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি — সদস্য

৩। একজন বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা জজ — সদস্য

৪। মানবাধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই ব্যক্তি — সদস্য

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ার

১। কমিশন সংবিধানের যুগ্ম তালিকা ও রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত মানব-অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিচার করতে পারবে।

২। যদি সেই বিষয়টি বিধিবদ্ধভাবে গঠিত অন্য কোনো কমিশনের বিচারাধীন থাকে তবে কমিশন সে বিষয়ে বিচার করতে পারবে না।

৩। জম্মু ও কাশ্মীরের মানব-অধিকার কমিশন ওই রাজ্যে প্রযুক্ত রাজ্য তালিকা (List III) বিষয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার করতে পারে।

নিয়োগ পদ্ধতি

রাজ্যপাল কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন। সদস্যদের নিয়োগের আগে তিনি এক বিশেষ কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সেই কমিটিতে থাকবেন— রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (সভাপতি), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা।

সদস্যদের কার্যকাল

5 বছর। সদস্যরা 70 বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। সেই বয়সসীমার মধ্যে থাকলে কোনো সদস্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন।

কমিশনের সদর দপ্তরের স্থান রাজ্য সরকার স্থির করবে।

কমিশনের প্রতিদিনের কাজ তদারক করার জন্য একজন সচিব থাকবেন।

- রাজ্য সরকার কমিশনের সদস্যদের বেতন ও ভাতা স্থির করেন। কোনো সদস্যের কার্যকালে তাঁর বেতন ও ভাতা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায় না।

পদচ্যুতি

রাষ্ট্রপতি কোনো সদস্যকে কতকগুলো কারণে পদচ্যুত করতে পারেন।

- সদস্য যদি দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয়।
- পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক বলে আদালত দ্বারা ঘোষিত হয়।
- নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হয়।
- সদস্যের অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের জন্য।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা (Functions and Power)

ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ওপরও সেসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১। মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে কোনো অভিযোগ এলে কমিশন বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করবে।

২। আদালতে যদি কোনো মামলা বিচারাধীন থাকে তবে কমিশন আদালতের সম্মতি নিয়ে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩। রাজ্যের জেলখানা ও সেখানে কয়েদিদের অবস্থা দেখে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে পারে।

৪। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারি অফিসারের কর্তব্যপালনে অবহেলা বা ত্রুটি বিষয়ে অনুসন্ধান করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে পারে।

৫। মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন ও সাংবিধানিক ধারাগুলোর যথাযথ রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৬। মানবাধিকার বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

৭। কমিশন তার কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবে। সরকার সেই রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করার সময় জানাবে কমিশনের কোন কোন সুপারিশ কার্যকর করেছে। যেসব সুপারিশ সরকার কার্যকর করেনি সে বিষয়ে কারণ জানাতে হবে।

তথ্যের অধিকার (Right to Information)

2005 সালে তথ্যের অধিকার আইন (Right to Information Act) পাশ হবার পর মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়। এর আগে সরকারি তথ্য ছিল The Official Secrets Act বা সরকারি গোপনীয়তা আইনের ঘেরাটোপে বদ্ধ। এর ফলে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের। RTI ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (transperency) ও দায়বদ্ধতা (accountability) সুনিশ্চিত করা এই আইনের উদ্দেশ্য।

এছাড়া ভারতীয় সংবিধানের Art 32 এবং Art 226 অনুসারে যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট আজ্ঞালেখ (writ) জারি করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত করতে পারে। এই আজ্ঞালেখগুলি হল— বন্দি প্রদর্শন (habeas corpus), পরমাদেশ (mandamus), প্রতিষেধ (prohibition), উৎপ্রেষণ (certiorari) এবং অধিকার পৃচ্ছ

(quo warranto)। Art 32 সুপ্রিম কোর্টকে 'মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকর্তা' (Protector of Fundamental Rights) হিসেবে এক বিশেষ ভূমিকা অর্পণ করেছে।

উগ্রপন্থীদের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও হিংসা যেমন চিন্তার কারণ তেমনি এগুলির মোকাবিলায় পুলিশের ভূমিকাও উদ্বেগজনক। আমাদের দেশে লক-আপে মৃত্যুর ঘটনা, পুলিশের প্রতিহিংসামূলক আচরণ, দমন-পীড়ন, বিচারাধীন বন্দিদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার কারও অজানা নয়। মানবাধিকার কর্মীদের মতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের নামে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে তাতে মানবাধিকার কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

এই পটভূমিকায় 1993 সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। গঠিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই এই কমিশন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে শুধু কমিশন গঠন করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, এর জন্য দরকার দারিদ্র্যের অবসান, সার্বিক সাক্ষরতা ও জনচেতনার বিকাশ।

শ্রী দুর্গাদাস বসু লিখেছেন যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এবং সমাজবিরোধী ও বিধ্বংসী শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এই বিধানগুলির প্রয়োজন। সংবিধান প্রণেতারা এর জন্য কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে গেছেন যেমন Art 32 এবং Art 226 যার দ্বারা যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট 'Writ' বা 'লেখ' জারি করতে পারে। তাই Art 22 'এক আবশ্যক অসৎ বস্তু' (necessary evil) হিসাবে সংবিধানে বিরাজ করছে।

তথ্যসূত্র:

১। বসু, দুর্গাদাস, *ভারতের সংবিধান পরিচয়*।
২। Noorani, A.G., *Challenges to Civil Rights Guarantees in India.*
৩। Singh, Ujjwal Kumar, *The State, Democracy and Anti-Terror Laws in India.*
৪। Singh, Kavita, *Human Rights and Anti-Terrorism Laws in India.*